# DEPARTMENT OF HISTORY
## Honours Course
### Semester : IV
### Paper/Core Course : VIII (Unit- 1)
### Name of the Teacher : Nilendu Biswas

**ভূমিকা ঃ** ভারতের ইতিহাসে মোগল যুগ একটি বিশেষ যুগের সূচনা করেছিল । ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই ভারতের ইতিহাস আমুল বদলে যায় । সুলতানি শাসনের অবক্ষয়ের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসে যে শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সেই শুন্যতাকে ভরাট করার কাজে বাবর তাঁর সাম্রাজ্যিক চরিত্রকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন । বস্তুত ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮১ বছরের মোগল শাসনকে গৌরবজনক অধ্যায় বলা হয় । যদিও ভারতে মোগল সাম্রাজ্য আরও ১৫০ বছর টিকে ছিল । পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অনুসরণে ভারতের মোগল সাম্রাজ্যও মজবুত ও সুদৃঢ় শাসন কাঠামো গড়ে তুলে ছিল । বহুধা জাতিতে বিভক্ত ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে যুদ্ধ জয়ের দ্বারা এক বিশাল কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছিল মোগল শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী চেতনার দ্বারা ।

শুধু তাইনয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশও গড়ে ওঠেছিল । যদিও শেষদিকের শক্তিশালী মোগল শাসক ঔরঙ্গজেবের গোড়া রক্ষণশীল ধর্মীয় নীতির কারণে এই হিন্দু মুসলমান ঐক্যে ফাটল ধরেছিল । সবচেয়ে বড় কথা মোগল শাসকেরা মধ্য এশিয়ার অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এদেশেই বসবাস করতে থাকেন । মধ্যযুগের সাম্রাজ্যবাদী ও লুণ্ঠনকারী মহম্মদ ঘোরি বা সুলতান মামুদের মত শাসকদের মত কেবল লুণ্ঠনের বাসনাকে মোগল শসাকেরা তাদের মনে স্থান দেননি । যে কারণে মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ভারতে অনেক বেশি দিন স্থায়ী হয়েছিল ।

**✡ মোগল ভারতে ইতিহাস চর্চার স্বরূপ ঃ** ইতিহাস চর্চা বলতে সাধারণভাবে আমাদের মনে হয় ইতিহাস নিয়ে আলোচনা । সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি বিষয় হিসাবে ইতিহাস চর্চা করা হয় । মোগল যুগে ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়, মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই ভারতে আগত মুসলিম পন্ডিতদের হাত ধরে ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল । সুলতানী যুগে বহু মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল । ইতিহাস চর্চার এই ঐতিহ্য মোগল যুগে আরও প্রসারিত হয়ে ছিল । মূলত দুটি ধারায় এইচর্চা অতিবাহিত হয়েছিল । এইযুগে একদিকে ইন্দো-পারসিক ইতিহাস চর্চার ধারা অনুসারে ঐতিহ্যবাদী প্রচলিত ধারায় চলত । অন্যদিকে তেমনি আধুনিক ধারার একটা প্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল ।

এইযুগের ইতিহাস রচয়িতাদের সামাজিক মর্যাদা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রাক মোগলযুগের চেয়ে পৃথক ছিল । রাজবৃত্ত বা রাজপরিবারের কাহিনী রচনায় এদের রাজানুগ্রহ বা আর্থিক লাভের বাসনা অনেক কম ছিল । পূর্বের ঐতিহাসিকরা রাজানুগ্রহ লাভের বাসনায় রাজার গুণ ও মহিমা কীর্তন করার জন্য ইতিহাস লিখতেন । এগুলিকে ঠিক ইতিহাস না বলে 'রাজ্যাখ্যান' বলা যেতে পারে । কিন্তু মোগল যুগে এই ধ্যান ধারণার বদল ঘটে । ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ঐশ্বরিক বিধান বলে ব্যাখ্যা করবার প্রবণতা থাকলেও সেখানে মানব ইতিহাসচর্চার কথাও গুরুত্ব পেয়েছিল । বস্তুত মানুষকে নিয়েই যে ইতিহাসের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়, তা এই পর্বের ঐতিহাসিকেরা যথার্থ উপলব্ধি করে ছিলেন । যে কারণে মানুষের সাধারণ ঘটনাও ইতিহাসের বিবরণ হয়ে ওঠে ঐতিহাসিকের নিপুণ হস্তচালনায় । তবে লক্ষ্যণীয় যে এইসময়ে ইতিহাসকে ধর্মের অনুশাসন থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয় । ধর্মীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইতিহাস আলোচনা বা লিপিবদ্ধ করার চল এই সময় বাতিল হয় । ঘটনার বিবরণ বা ইতিহাসের তথ্যকে যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ, ঘটনাকেন্দ্রিক ও বিশ্লেষনাত্মকভাবে রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল । এপ্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'মোগল যুগে ইতিহাস চর্চায় কার্য-কারণ সম্পর্কে গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা যায় ।'

ঐতিহাসিকগণ মোগলযুগের ইতিহাসচর্চায় তিনটি ধারার কথা বলতে চেয়েছেন । যেমন--ক) সমকালীন ইতিহাস, খ) সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস ও গ) আধুনিক ইতিহাস । মোগল যুগের সমকালীন ইতিহাস সেইযুগের ঐতিহাসিক বা ইতিহাস রচয়িতাদের হাত ধরে প্রবাহিত হয়েছিল । আবুল ফজল, আব্দুল হামিদ লাহোরী, আব্দুল কাদির বদাউনি, নিজামউদ্দিন আহমেদ, কাফি খাঁ, ভীমসেন ও ঈশ্বরদাস প্রমুখ ছিলেন এইধারার ঐতিহাসিক । তারা সমকালীন ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সরকারী দলিল-দস্তাবেজ ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়ে ছিলেন । এই কারণে দরবারী লেখকদের রচনার মূল্য অনেক বেশী । তবে তাদের রচনায় যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা সম্রাট ও অভিজাতদের

জীবনযাত্রার কথা বেশি আলোচিত হয়েছে । সাধারণ মানুষের কথা বা সেই যুগের আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের কথা তাদের রচনায় স্থান পায়নি । সামাজিক অবস্থার সেরকম বর্ণনা এদের রচনায় সেভাবে ফুঁটে ওঠেনি । এই কারণে ইতিহাস এখানে ঠিক ইতিহাসের পথ অনুসরণ করতে পারেনি । তা হলেও এরা যেহেতু মোগল শাসকদের খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন এবং শাসকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলা মেশা করতে পেরেছিলেন, সেহেতু ঘটনার বিবরণ তত নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন । অর্থাৎ, তাদের ঘটনার বিবরণ সত্য তথ্যের উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে ।

মোগল যুগের ইতিহাস চর্চায় বিদেশী প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না । যে কারণে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন, 'ভারতীয় ইতিহাস চর্চা ও ইতিহাসমূলক যুক্তিবাদী ধ্যান ধারণা ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে'। অর্থাৎ, ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের হাত ধরেও মোগল যুগের ইতিহাস চর্চা প্রসারিত হয়েছিল । তবে মোগল যুগের ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে এরা ছিলেন উন্নাসিক । তারা সমকালীন ইউরোপের সঙ্গে ভারতের তুলনামূলক আলোচনা করতে চেয়েছিলেন । জন ব্রিগস প্রমুখ মনে করতেন, মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস গ্রন্থগুলি তথ্য নির্ভর নয় । কিন্তু গ্রান্ট ডাফ, এলফিনস্টোন প্রমুখ মোগল যুগের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পাশাপাশি সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন । হিন্দুধর্মের উপর ইসলামের প্রভাবের কথাও তারা উল্লেখ করেছেন । কিন্তু পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিতে লালিত-পালিত এই ঐতিহাসিকরা তাদের দেশের অনুকরণে ভারতের ইতিহাস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন । তাই পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকেরা, যেমন ইলিয়ট, ডাওসন প্রমুখ মনে করেন, মধ্যযুগের ঐতিহাসিকেরা সামান্যই তথ্য রেখে গেছেন ।

উনিশ শতকের শেষদিকে ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে মোগল যুগের ইতিহাস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন । এক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান স্যার যদুনাথ সরকার । তিনি "History of Aurangzeb', "Fall of the Mughal Empire' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । মোগল ইতিহাস চর্চায় তাঁর দীর্ঘ মেয়াদী অবদানের জন্য ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী যদুনাথকে 'Columbus of Mouhjal History' বলে অভিহিত করেছেন । তবে যদুনাথের এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল, তিনি মোগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস আলোচনা করলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে কিছু লেখেননি ।

আলিগড় গোষ্ঠী মোগল যুগের ইতিহাস চর্চার উপর জোর দিয়েছে । এই গোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত ঐতিহাসিকরা হলেন, সতীশচন্দ্র, ইরফান হাবিব, আতহার আলি, নোমান আহমেদ সিদ্দিকি, গৌতম ভদ্র, শিরিন মুসবি প্রমুখ । এরা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মোগল ইতিহাস বিশ্লেষণ করেননি । এদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গিও এক নয় । তা সত্ত্বেও এরা মার্কসীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানসম্মত ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন । বলাবাহুল্য, এদের রচনার মধ্যে দিয়ে মোগল যুগের ইতিহাস চর্চা যেমন সমৃদ্ধতর হয়েছে, তেমনি এদের বিশ্লেষণ আমাদের মোগল যুগের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে ।

✡ **মোগল ভারতে ইতিহাস চর্চায় সমীক্ষা ও উৎসের বিভিন্ন দিক ঃ** মোগল যুগের ঐতিহাসিকদের বেশিরভাগ ছিলেন দরবারের সভাসদ, অনেকে সভাসদ হবার স্বপ্ন দেখতেন । অবশ্য কাফি খান, ভীমসেন বা ঈশ্বরদাস প্রমুখ কাছ থেকে মোগল রাজশক্তির উত্থান-পতন চোখে দেখেছেন, তাই সভাসদ হবার স্বপ্ন নিয়ে তারা ইতিহাসচর্চা করেননি । আবার বাবর, গুলবদন বেগম ও জাহাঙ্গীর আত্মজীবনী লিখেছেন, যেগুলি মোগল ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য আকর । দেখাগেছে দরবারি ঐতিহাসিকরা দরবারি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়তেন, তাই দলাদলি ছিল, জাতি, ধর্ম ও গোষ্ঠী আনুগত্য ছিল । দরবারি ঐতিহাসিকরা ছিলেন অভিজাততন্ত্রের অর্ন্তভূক্ত, এজন্য দরবারি রাননীতির উত্থান-পতনের কথা তাঁরা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন । সম্রাট ও দরবার হল তাদের বিষয়বস্তু, তাই দরবারী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দরবার ও রাজবংশ কেন্দ্রিক, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কথা তাঁরা বলেছেন ।

ইতিহাসচর্চার দিক প্রসঙ্গে বলা যায়, মোগল যুগে ইতিহাসচর্চায় পরিবর্তন এসেছে, ইতিহাস চিন্তা, পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন এসেছে । ইতিহাসচর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, যার প্রথম পরিবর্তন দেখা দিয়েছেল ধর্মের বন্ধন থেকে ইতিহাসের মুক্তি । সুলতানি যুগের ঐতিহাসিক মানব জীবনের সব কর্মকান্ডকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে ব্যাখ্যা করেছেন । সবকিছু ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে থাকে বলে তাদের লেখায় স্থান পেয়েছে । কিন্তু আবুল ফজল এধরণের ইতিহাস ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি । তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যা অনেক যুক্তিবাদী ও বাস্তব, তিনি বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন । তবে আবুল ফজল আকবরের প্রশংসা করলেও বদাউনি তাঁর দুর্বলতাগুলি প্রকাশ করে দিয়েছেন। এইভাবে মোগল যুগে সমালোচনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির সূত্রপাত হয় ।

মোগল যুগে ইতিহাসচর্চায় পরিবর্তনের ঢেউ আরও ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছিল । রাজবংশ ও রাজার কাহিনি যেমন আছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রশাসন, নীতি ও অভিজাততন্ত্রের কথা এবং সামাজিক ও আর্থিক পরিসংখ্যান । এরফলে মোগল ইতিহাস রচনা পদ্ধতির ধারণা গড়ে উঠেছে । বারণী যেভাবে ইতিহাস লিখেছেন আবুল ফজল সেভাবে লেখেননি । মোগল যুগ থেকেই আধুনিক ইতিহাস পদ্ধতির যাত্রা শুরু হয়েছে । আধুনিক ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতির কিছু গুণ স্পষ্ট হয়েছে । ঐতিহাসিকরা স্বতন্ত্রভাবে ঘটনাবলীকে দেখেছেন, তাদের

মধ্যেকার সম্পর্কের অনুসন্ধান করেননি । মানুষের কাজকর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু কর্মকান্ড প্রভাবিত হয় রাজার নীতি দ্বারা । রাজার চরিত্র ইতিহাসের একটি চালিকা শক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে ।

আর্থ-সামাজিক শক্তি বা মানবিক কর্মকান্ড যে ইতিহাসের চালিকা শক্তি হতে পারে এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । আকবর ধর্মনিরপেক্ষ উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, কারণ যুক্তিবাদী, সত্যানুসন্ধানী, ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত তার মনোলোক গঠনে সহায়ক হয়েছে । হামিদ লাহোরি বা কাফি খান একই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন । তবে বহু উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিচার-বিশ্লেষণ করে ইতিহাস রচনার ধারণা তৈরি হয়েছে । একটি উৎস বা জনশ্রুতি বা পূর্ববর্তী লেখকের ইতিহাস নির্ভর করে ইতিহাস লেখা হয়নি । যদুনাথ সরকার মনে করেন, ‘মোগল যুগের লেখার ঢঙটা এমন ছিল যে পাঠকদের মনে হতে পারে ঐতিহাসিক নির্লজ্জভাবে শাসকের গুণগানে মত্ত হয়েছেন । সব সময় তাঁরা শাসকের প্রশংসা করতেন না ।’

শাসকদের গুণগান আছে, কিন্তু মোগল যুগের ঐতিহাসিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ভাষণ করেননি । বস্তুত এই সময় যেসব অতিশয়োক্তি আছে সেগুলি সহজে সংশোধন করা যায় । কারণ ভীমসেন, কাফি খান, নিজামউদ্দিন ও বদাউনি নির্ভয়ে পক্ষপাতশূন্য হয়ে ইতিহাস লিখেছেন । মোগল যুগের ইতিহাসে পক্ষপাতিত্ব ও পক্ষপাতশূন্যতা দুই-ই পাওয়া যায় । আবুল ফজল পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন, বাদাউনি নির্ভয়ে পক্ষপাতিত্বহীন ইতিহাস উপহার দিয়েছেন । তাই এদের ইতিহাস পাঠ করে ভারসাম্যপূর্ণ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব । এপ্রসঙ্গে হরবনস মুখিয়া লিখেছেন, ‘মোগল যুগের ঐতিহাসিক সূক্ষ্মভাবে আধুনিক কালের ঐতিহাসিককে প্রভাবিত করেছেন । আকর থেকে তাঁরা যে ধরণের তথ্য পেয়েছেন সেভাবে ইতিহাস লিখেছেন । সম্রাট, দরবার, রাজনীতি, যুদ্ধ, অভিজাততন্ত্র মোগল ইতিহাসে প্রাধান্য পেয়েছে ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মোগল ঐতিহাসিক যেভাবে কাঠামো নির্মাণ করে দিয়েছেন তার বাইরে গিয়ে নতুন করে কাঠামো নির্মাণ করে ইতিহাসচর্চা অবহেলিত হয়েছে । মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ আধুনিক ঐতিহাসিকরা এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারেননি । মোগল ঐতিহাসিক কেন্দ্রীভূত শাসনকে গুরুত্ব দিয়ে ইতিহাস লিখেছেন । আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রের ধারণাকে তাঁরা গুরুত্ব দেননি । আধুনিক ঐতিহাসিকরা বলতে চান যে মোগল যুগে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ছিল শক্তিশালী, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রের বিকাশ তেমন হয়নি । তাই ইরফান হাবিব, আতহার আলি মোগল যুগের কাঠামোকে অনুসরণ না করে নতুন করে নির্মাণ করে নিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার কাজ চালিয়েছেন । প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রা, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য, বিদেশিদের রচনা সব কিছুই এখন মোগল ইতিহাসের উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে । শুধু আবুল ফজল ও বদাউনির ইতিহাস পাঠ করে আকবরের ইতিহাস রচনার চেষ্টা আর দেখা যায় না ।

✡ **ইতিহাসের উপাদান ঃ** ভারতের ইতিহাসে মোগল যুগ একটি বিশেষ যুগের সূচনা করেছিল । ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই ভারতের ইতিহাস আমূল বদলে যায় । সুলতানি শাসনের অবক্ষয়ের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসে যে শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সেই শুন্যতাকে ভরাট করার কাজে বাবর তাঁর সাম্রাজ্যিক চরিত্রকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন । বস্তুত ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮১ বছরের মোগল শাসনকে গৌরবজনক অধ্যায় বলা হয় । যদিও ভারতে মোগল সাম্রাজ্য আরও ১৫০ বছর টিকে ছিল । পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অনুসরণে ভারতের মোগল সাম্রাজ্যও মজবুত ও সুদৃঢ় শাসন কাঠামো গড়ে তুলে ছিল । বহুধা জাতিতে বিভক্ত ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে যুদ্ধ জয়ের দ্বারা এক বিশাল কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছিল মোগল শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী চেতনার দ্বারা । শুধু তাইনয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশও গড়ে ওঠেছিল । যদিও শেষদিকের শক্তিশালী মোগল শাসক ঔরঙ্গজেবের গোড়া রক্ষণশীল ধর্মীয় নীতির কারণে এই হিন্দু মুসলমান ঐক্যে ফাটল ধরেছিল । সবচেয়ে বড়কথা মোগল শাসকেরা মধ্য এশিয়ার অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এদেশেই বসবাস করতে থাকেন। মধ্যযুগের সাম্রাজ্যবাদী ও লুন্ঠনকারী মহম্মদ ঘোরি বা সুলতান মামুদের মত শাসকদের মত কেবল লুন্ঠনের বাসনাকে মোগল শসাকেরা তাদের মনে স্থান দেননি । যে কারণে মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ভারতে অনেক বেশি দিন স্থায়ী হয়েছিল ।

ভারতের ইতিহাসে প্রাচীন যুগে লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রচন্ড অভাব পরিলক্ষিত হলেও মোগল যুগ সম্পর্কে একথা বলা যায় না । এইযুগে প্রচুর ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পাওয়া গেছে । এগুলি থেকে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বহু তথ্য পাওয়া যায় । এইযুগের ইতিহাসের উপাদানকে আমরা চারভাগে ভাগ করতে পারি । যেমন- ক) সাহিত্য, খ) সরকারী নথীপত্র, ফরমান ও চিঠিপত্র, গ) ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ ও বাণিজ্য কুঠির নথীপত্র, ঘ) মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন ।

**ক) সাহিত্য ঃ** প্রথমেই আমরা আলোচনা করতে পারি সাহিত্য নিয়ে । বিভিন্ন মোগল সম্রাট ও রাজ পরিবারের সদস্যদের রচিত স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনী থেকে ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যায় । সিন্ধু প্রদেশে আরব বিজয়ের সময় থেকে ইতিহাস লেখা চলতে থাকে । তবে মোগল যুগের ইতিহাস অনেকটা স্বাতন্ত্য রূপ নিয়ে আর্বিভুত হয় । পূর্বেকার নীতিমূলক বিষয়ের উপর গুরুত্ব অনেক কমে যায় । মোগল ইতিহাস চর্চা এমনকি মহিলাদের হাতেও লিপিবদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছিল । বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম ইতিহাস লেখায়

পারদর্শী ছিলেন । তাঁর ‘হুমায়ুননামা’ ছিল সেই যুগের এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক রচনা । বস্তুত বাবর থেকে শুরু করে ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত মোগল শাসকদের রাজত্ব কালের বিবরণ বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের হস্ত লেখনিতে পরিস্কার ভাবে ফুঁটে ওঠেছে । এই সময়কার ঐতিহাসিকরা তাদের গ্রন্থ রচনার জন্য যেসব উপাদানের সাহায্য নিয়েছেন, তা সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে এক অনন্য রূপ ধারণ করেছে । যে কারণে আমরা দেখতে পাই প্রায় প্রত্যেক মোগল শাসকদের রাজত্ব কালের অন্তত একটা করে ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাওয়া গেছে ।

বাবরের আত্মজীবনী ‘বাবরনামা’ বা ‘তুজুক-ই-বাবরী’ গ্রন্থে বাবরের রাজত্ব কালের বিবরণ পাওয়া যায় । বাবর এই গ্রন্থে ভারতীয় জলবায়ু, নরনারী, জীবনযাত্রা সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন । তুর্কি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থকে ঐতিহাসিক এলফিন স্টোন, শ্রীবাস্তব প্রমুখ মোগল যুগের ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ বলে মনে করেন । একইভাবে মির্জা মহম্মদ হায়দারের ‘তারিখ-ই-রশিদ’ গ্রন্থ থেকে বাবরের কথা যেমন জানা যায়, তেমনি জানা যায় হুমায়ুনের কথা । বস্তুত লেখক নিজেই সমসাময়িক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাই বাবরের সংগ্রাম, হুমায়ুনের পলায়ন, এবং সমসাময়িক ঘটনার বিবরণ অত্যন্ত বিমূর্ত ভাবে ফুঁটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন । বাবর কন্যা গুলবদন বেগম রচিত ‘হুমায়ুননামা’ থেকে বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্ব কালের বিবরণ পাওয়া যায় । রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার অনেক তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যায় । এছাড়াও জওহর আফতাবের ‘তাজ-কিয়াৎ-উল-ওয়াকিয়াৎ’, কোন্দ আমির রচিত ‘হাবিস-উস-সিয়ার’ গ্রন্থ থেকেও হুমায়ুনের রাজত্ব কালের ইতিহাস পাওয়া যায় । আবুল ফজল রচিত ‘আকবরনামা’ও ‘আইন-ই-আকবরী’ আকবরের এবং জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ‘তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী’ থেকে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের বিভিন্ন ঘটনাবলী জানা যায় । অবশ্য, জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে পিতার ধর্মবিশ্বাস, তাঁর নিজের রাজত্বের ঘটানাবলী লিপিবদ্ধ করলেও বেশ কিছু সত্য ঘটনা চেপে গেছেন । একই ভাবে শাহজাহানের রাজত্বকালের জন্য আব্দুল হামিদ লাহোরী রচিত ‘পাদশাহনামা’ এবং ঔরঙ্গজেবের জন্য কাফি খানের ‘মুন্তাখাব-উল-লুবাব’-এর উপর নির্ভর করা যায় ।

আবার আঞ্চলিক ভাষায় রচিত গুজরাট, রাজস্থান, বাংলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাদেশিক গ্রন্থ-গুলিও এইযুগের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বীকৃত । কেশব দাসের ‘জাহাঙ্গীর চন্দ্রিকা’ ও ‘বীরসিংহদেব চরিত’ এবং বারাণসীদাসের ‘অর্ধকথনক’, লালকবি রচিত ‘অমর বংশাবলী’ প্রভৃতি হিন্দি ভাষায় রচিত । রাজপুত কবিদের গাথা, পৃথবীরাজ রসো, পদ্মাবৎ, শিখদের গ্রন্থসাহেব, গুরু গোবিন্দ সিংহের রচনাবলী এবং বাংলার ইতিহাসের জন্য গোলাম হোসেন সলিমের ‘রিয়াজ-উস-সালাতিন’ অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । বাংলা ভাষায় জয়ানন্দ রচিত ‘চৈতন্যমঙ্গল’, কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের ‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্য, বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্য ভাগবৎ’, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ থেকে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায় । মারাঠি ভাষায় রচিত সভাসদ বাখরের ‘শিব ছত্রপতি চরিত’ এবং ‘শিবকালীন পত্রসার সংগ্রহ’ অমূল্য উপাদান ।

**খ) সরকারী নথীপত্র, ফরমান ও চিঠিপত্র ঃ** এইযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে সরকারী নথীপত্র, ফরমান ও চিঠিপত্রের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । মহান সম্রাট আকবরের আমলের এবং তার পরবর্তীকালের পাঁচটি অমূল্য রাজকীয় নির্দেশনামা পাওয়া গেছে । এগুলি ছিল (১) ‘জারিদাত-ই-ফার্মান-ই-সালাতিন’, (২) রাজকীয় নির্দেশনামা’, (৩) পাঞ্জাবের নাথ সম্প্রদায়ের যোগীদের প্রদত্ত জমির দান সংক্রান্ত কাগজপত্র, (৪) আকবর ও জাহাঙ্গীর কর্তৃক পার্শিদের প্রদত্ত ‘মদদ-ই-মাস’ দানপত্র ও (৫) রাজপুত পরিবার ও বীরদের জন্য ঘোষিত খেতাব, অধিকার-পত্র, দানসংক্রান্ত দলিল । এছাড়াও জয়পুরের শাসকের উদ্দেশ্যে ভকিলের প্রতিবেদনের একটি সংকলন পাওয়া গেছে । মোগল আমলে এইসব নথীপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও কালের প্রকোপে তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে । তা সত্ত্বেও যেটুকু টিকে আছে, সেগুলি থেকে মোগল যুগের নানান তথ্যাদি পাওয়া যায়, মোগল যুগের ইতিহাস রচনায় এগুলির মূল্য অপরিসীম ।

**গ) ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ ও বাণিজ্য কুঠির নথীপত্র ঃ** মোগল আমলে পর্তুগিজ, স্পেনীয়, ফরাসি, ইতালীয়, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির বহু বণিক ও পর্যটক ভারতে আসেন । তাদের মধ্যে র‍্যালফ ফিচ, টেরি, মানরিখ, বার্ণিয়ে, হকিন্স, টমাস রো, বার্টন, মানুচি প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাদের রচনা থেকে সমকালীন জনজীবন, রাজ্যের শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় । আকবরের রাজত্বকালে সিজার ফ্রেডারিক ও র‍্যালফ ফিচ, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে টমাস রো ও পোলসার্ট, শাহজাহানের আমলে ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ে, ঔরঙ্গজেবের সময়ে তেভার্নিয়ে, মানুচি ও এডওয়ার্ড টেরি প্রমুখ বিদেশী পর্যটক ভারতে এসেছিলেন । এদের বিবরনী ছাড়া মোগল যুগের প্রাণবন্ত ও সার্বিক ইতিহাস লেখা এক কথায় অসম্ভব । তবে আমাদের মনে রাখা দরকার, এই সব বিদেশি বণিক ও পর্যটকদের দেওয়া তথ্য সর্বদা সঠিক নয় । কারণ দেশীয় ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না । তাই বহুক্ষেত্রে তারা শোনা কথা ও গুজবের উপর নির্ভর করে বিবরণ রচনা করেছেন । তা সত্ত্বেও মোগল যুগের ইতিহাস রচনার এদের বিবরণের যে একটা গুরুত্ব আছে, তা অস্বীকার করা যাবে না ।

**ঘ) মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন ঃ** সমসাময়িক মুদ্রাগুলি থেকেও মোগল যুগের ইতিহাস, বিশেষ করে অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় । মুদ্রার গুরুত্ব এই কারণে যে মুদ্রা থেকে সেইযুগের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ধাতু শিল্পের অগ্রগতি ও অবনতির কথা জানা যায় । মুদ্রা ছাড়াও মোগল আমলের শিল্পকীর্তি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে । এগুলি থেকে মানুষের

সুকুমার বৃত্তি, শিল্প নৈপুন্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের কথা জানা যায় । মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্পকলার উপর আলেকজান্ডার কানিংহাম, স্যার জন মার্শাল, জেমস ফার্গুসন, ভিনসেন্ট স্মিথ, পার্সি ব্রাউন প্রমুখ স্থাপত্যবিদদের কিছু অমূল্য মৌলিক রচনা আছে । এছাড়াও কোলকাতা যাদুঘর, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির, বেনারস কলাভবন, জয়পুর মিউজিয়াম, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ইত্যাদি স্থানে মোগল আমলের বহু চিত্রকলার নিদর্শন আজও সযত্নে রক্ষিত আছে ।

অস্বীকার করা যাবে না যে মোগল যুগের ইতিহাস সাহিত্য খুব উচু মানের । যদিও এযুগের লিখিত সব বিবরণী ঠিক ইতিহাস পদবাচ্য নয় । অনেকগুলি মূলত রোজনামচা বা ডাইরি জাতীয় বিবরণ । হয়তো ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থ ছিল, কিন্তু আজ তার কোন চিহ্ন নেই । কথিত আছে, আকবরের গ্রন্থাগারে প্রায় ২৪ হাজার পান্ডুলিপি ছিল । কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণ, প্রকৃতির প্রতিকূলতা এবং আবহাওয়ার জন্য বহু ঐতিহাসিক উপাদান নষ্ট হয়ে গেছে । ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তব মোগল আমলের ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে বলেছেন, ‘মুঘল যুগের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিতর্কিত সময়কাল নির্ধারণ এবং সমকালীন অর্থনীতির উপর আলোকপাত করার দিক থেকে এই উপাদানগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।’(These are of great value in settling conflicting dates, and also throwing light on the economic condition of the age.)

✡ **আবুল ফজল ঃ** ভারতবর্ষে মুসলমান শক্তির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন প্রবণতার সৃষ্টি করেছিল, তেমনি জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও নতুন এক যুগ বহন করে এনেছিল । মোগল যুগের ইতিহাসচর্চা বিশেষ করে দরবারী ইতিহাসের শ্রেষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন আবুল ফজল । আকবরের মন্ত্রী, বন্ধু, রাষ্ট্রনেতা, কূটনীতিবিদ ও সামরিক অফিসার আবুল ফজল ইতিহাস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন । শৈশবেই তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে ছিলেন । ১৫ বছর বয়সে তিনি জ্ঞানার্জনের সমস্ত শাখায় দক্ষতা লাভ করেন । নির্যাতিত ও অত্যাচারিত পরিবারের দুর্ভাগ্য আবুল ফজলের চিন্তার উপর গভীর ছাপ ফেলেছিল । মোগল সম্রাট আকবরের আশ্রয় ও পৃষ্টপোষকতা লাভ করার পর তিনি রচনা করেন দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ-‘আকবরনামা’ ও ‘আইন-ই-আকবরী’ ।

মধ্যযুগের ভারতের ঐতিহাসিকদের মধ্যে আবুল ফজল ছিলেন সবচেয়ে প্রতিভাবান । ‘আকবরনামা’-র দ্বিতীয় খন্ডে তিনি ইতিহাস ও ইতিহাস তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মতামত রেখেছেন । পূর্বসূরীদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি । তিনি বলেছেন, ‘এদের কাছে ইতিহাস হল মুসলমানদের ভারত জয়, শাসন এবং হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ।’ কিন্তু আবুল ফজলের কাছে ইতিহাস ছিল জ্ঞানদীপ্তির উৎস, যুক্তিবাদের প্রসারের সহায়ক জ্ঞান । তাঁর ইতিহাস দর্শনের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে ইতিহাস পদ্ধতি । তিনি জানতেন, খুব যত্ন করে অনুসন্ধান চালিয়ে উপাদান সংগ্রহ করতে হয় । যুক্তি ও তথ্যের অভাব হলে ইতিহাস হবে গল্প-কাহিনী, প্রকৃত ইতিহাস নয় । এমনকি ইতিহাস ও দর্শনের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক আছে বলে আবুল ফজল মনে করতেন ।

আবুল ফজল হলেন মধ্যযুগের একমাত্র ঐতিহাসিক, যিনি বহুমাত্রিক ইতিহাস রচনা-পদ্ধতির কথা বলেছেন । একটিমাত্র উপাদান সংগ্রহ নয়, মূল আকর সংগ্রহের উপর তিনি জোর দিয়েছেন । বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যতা যাচাই করে তিনি ইতিহাস লেখার পক্ষপাতি ছিলেন । প্রতিবেদন, স্মারক লিপি, বাদশাহী ফরমান এবং অন্যান্য তথ্য তিনি সযত্নে ব্যবহার করেছেন । আকবরের সাম্রাজ্যিক ধারণা, শাসনব্যবস্থা, জনকল্যাণকামী নীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার তিনি ছিলেন উৎসাহী সমর্থক । এজন্য তাঁর রচনা হয়েছে কিছুটা পক্ষ পাতিত্বপূর্ণ ও আকবরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । তিনি সমকালীন ইতিহাসের তথ্য-পূর্ণ বিবরণ রেখেছেন । অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে হিন্দুদের ধর্ম, দর্শন, সামাজিক আচারণ ইত্যাদি অনুধাবণের চেষ্টা করেছেন ।

এই মহান ঐতিহাসিকের মূল্যায়নে তাঁর অপূর্ণতার কথাও উল্লেখ করতে হয় । অনেক পরিশ্রম করে তিনি আকবরের শাসনকালের অনেক খুঁটিনাটি তথ্য সরবরাহ করেছেন । কিন্তু বর্ণনা দেবার সময় তিনি মন্ময়চিত্ত বস্তু জগতের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে পারেননি । শাসনের বাস্তব চিত্র তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না, ঘটনা ও চরিত্রের উপর তিনি নিজস্ব মতামত চাপিয়েছেন । আবুল ফজল প্রথা ও ঐতিহ্য নয়, যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন । অথচ বীরনায়ক আকবরকে তিনি এই মাপকাঠিতে বিচার করেননি । আকবরের দুর্বলতাকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন । আবার আকবরের ইবাদৎখানা, ধর্মচিন্তা, উলেমাদের সঙ্গে বিরোধ ইত্যাদির যে বিবরণ তিনি দেয়েছেন, সেটাও সত্য ও সম্পূর্ন নয় । এই কারণে তাঁর মতামতকে নিরপেক্ষ ও তথ্য নির্ভর বলে গ্রহণ করা যায় না ।

আরও অনেক ক্ষেত্রে আবুল ফজল ঐতিহাসিকের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেননি । তিনি শেরশাহের কৃতিত্বকে লঘু করে দেখিয়েছেন । এখানে ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা অবশ্যই ক্ষুন্ন হয়েছে । বস্তুত আবুল ফজল আকবরকে নিয়ে এতই ব্যস্থ ছিলেন যে অনেক কিছুই বাদ দিয়েছেন । সমসাময়িক রাজপুত, আফগান ও মোগলদের মধ্যে যে ত্রিপক্ষিয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল সে বিষয়ে আবুল ফজল নিরব থেকেছেন । একইভাবে রাজসভার বাইরের জীবনের কোন বর্ণনা তাঁর বিবরণে নেই । আসল কথা তাঁর শিক্ষা ও মনন এমন ছিল যে তিনি সাধারণ ও অগভীর বিষয়ে দৃষ্টি দিতে পারেননি । এই কারণে তাঁর ইতিহাস হয়েছে একপেশে ও অসম্পূর্ণ ।

এইভাবে আমরা দেখতে পারি, আবুল ফজল নিরপেক্ষ ভাবে রাষ্ট্র ও সমাজের চিত্র তুলে ধরতে পারেননি । তিনি এই কারণে বদাউনি, বারনী, নিজামুদ্দিন বা ফেরিস্তার চেয়ে অনেকটা পিছিয়ে আছেন । এসব স্বীকার করেও আমরা বলতে পারি তিনি একেবারেই ব্যর্থ নন । তিনি বহুমাত্রিক ইতিহাসচর্চার প্রবর্তন করেন, যা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবী করতে পারে । ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বিস্তার তাঁর হাত ধরেই সম্ভব হয়েছিল । প্রদেশগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রশাসনিক নিয়ম ইত্যাদির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন । তাই বলা যায়, ঐতিহাসিক হিসাবে আবুল ফজলের অবদান কোনভাবেই নগন্য নয়, বরং স্থায়ী ও চিত্তাকর্ষক ।

✡ **আব্দুল কাদির বদাউনি ঃ** মুসলমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে আব্দুল কাদির বদাউনি একটি বিশেষ নাম । ইতিহাসে ‘বদাউনি’ নামে পরিচিত এই ঐতিহাসিক উত্তর প্রদেশের রোহিলখন্ডের বদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতা মুলুক শাহ ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ । শৈশবে পিতা তাঁকে সন্তদের কাছে নিয়ে যান শিক্ষালাভের জন্য । সেইযুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের কাছে শিক্ষালাভ করে বদাউনি বিদ্বান হয়ে ওঠেন । ইতিহাস, জ্যোতিষ, সঙ্গীত বিদ্যায় তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন । সেইযুগে ইতিহাসকে জ্ঞানের একটি প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হত, তাই তিনি ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ঠ হন । বদাউনির মতে, ‘ইতিহাস হল বিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যম ও সাবধানবাণী ।’

ধর্মশাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করায় খুব শীঘ্রই বদাউনি আকবরের পৃষ্টপোষকতা লাভ করেন । তাঁর শিক্ষকেরা সকলেই উদার না হলেও ছিলেন সহনশীল ও ধর্মন্ধাতার বিরোধী । উলেমাদের অনেককে তিনি তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন । বদাউনির লেখার হাত খুব ভাল ছিল, তিনি অনায়সে লিখতে পারতেন । পরিষ্কার ভাবে নিজের মতামত তুলে ধরতেন । উলেমাদের আত্মরম্ভিতা, ধর্মন্ধতা ও ত্রুটিপূর্ণ আচারণের জন্য তিনি উলেমাদের পছন্দ করতেন না । বদাউনি গোড়া ছিলেন, কিন্তু সহানুভূতিহীন, হৃদয়হীন ও সংকীর্ণমনা ছিলেন না । সুফিসন্ত ও ধর্মের ধ্বজাধারীদের তিনি ব্যঙ্গ করেছেন । কারণ, এরা সম্রাট ও সভাসদদের প্রবঞ্চনা করে সম্পদ ও প্রভাবের অধিকারী হতেন ।

লেখার সাহিত্যগুণ সম্পর্কে বদাউনি সচেতন ছিলেন । তার্কিক হিসাবে তিনি মর্যাদা পেয়েছেন । নিজের জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা অকপটে স্বীকার করেছেন । আকবরের নির্দেশে তিনি আরবি ও সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সিতে অনুবাদ করেন । মহাভারতের ফার্সি অনুবাদের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন । আকবর ইমাম পদ এবং ১০০০ বিঘার মাদাদিমাস জাগির প্রদান করলেও, বদাউনি ক্রমশ সম্রাটের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন । তিনি ফৈজি ও আবুল ফজলের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন । ধর্ম সম্পর্কে আকবরের স্বাধীন চিন্তা, সমন্বয়বাদী ধ্যানধারনা, প্রশাসনিক সংস্কার এবং অমুসলমানদের পৃষ্টপোষণ তিনি পছন্দ করেননি । অন্যদিকে আকবরও অনুভব করেছিলেন যে বদাউনি মনে প্রাণে ছিলেন ধর্মান্ধ । তাই বদাউনি হয়তো বলতে পেরেছিলেন, ‘আকবর তাঁর ধর্মমতের বিরোধীদের সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন ।’

বদাউনি মনে করেন, উলেমা ও আকবরের সভাসদরা ছিলেন সমান অপরাধী । এরা শরিয়ৎকে মেনে নিতে চাননি । শুধু তাইনয়, বদাউনি তাঁর ভারসাম্য হারিয়ে ফৈজি, আবুল ফজল এবং স্বয়ং সম্রাটকে আক্রমণ করেন । আসল কথা সম্রাটের চাকরীতে তাঁর তেমন উন্নতি না হওয়ায় তিনি আকবরের প্রতি বিরুপ ছিলেন । এই কারণে ভগ্নহৃদয়ে তিনি রচনা করেন ‘মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ’। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে তিনি আকবরের শাসনের বর্ণনা দিয়েছেন । বলাবাহুল্য, এই গ্রন্থে আকবরের এত সমালোচনা আছে যে গ্রন্থখানি গোপন রাখা হয় এবং পরে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রকাশ করা হয় । এপ্রসঙ্গে মোরল্যান্ড লিখেছেন, ‘গ্রন্থখানি ঠিক ইতিহাস নয়, স্মৃতিচারণ বা সাংবাদিকের প্রতিবেদন । বিষয় নিজের গুরুত্বের জন্য নির্বাচিত হয়নি, ঐতিহাসিকের ভাল লাগার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়েছে ।’

রচনা উৎস প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি, বদাউনি মূলত নিজামুদ্দিনের ‘তবাকৎ-ই-আকবরী’ অনুসরণ করে তাঁর ইতিহাস লিখেছেন । এই কারণে নিজামুদ্দিনের নিকট তিনি ঋণস্বীকার করেছেন । কিছু তথ্য ‘তারিখ-ই-মুবারকশাহি’ থেকেও সংগ্রহ করেছেন । তাহলেও বদাউনির গ্রন্থে অনেক নতুন তথ্য আছে । গ্রন্থের তৃতীয় ও শেষভাগে তিনি আকবরের রাজসভার সন্ত, দার্শনিক, চিকিৎসক, কবি ও সাহিত্যিকদের পরিচয় দিয়েছেন । এখানে তিনি মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন । যদিও তাঁর ইতিহাস সকলের জন্য নয়, তিনি মুষ্টিমেয় ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য ইতিহাস লিখেছেন । ইতিহাস তত্ত্ব ও প্রকৃতি নিয়ে বদাউনির অনুসন্ধিৎসা ছিল না । গভীর অনুসন্ধান করেও তিনি নতুন কিছু দাঁড় করাননি । তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছিল কবি ও তার কাব্য ।

পরিশেষে বলা যায়, বদাউনি সত্যকে প্রকাশ করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন । সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা দেননি । বদাউনির মধ্যে রসবোধের অভাব ছিল না । তাঁর রচনায় বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধের উদাহরণ ছড়িয়ে আছে । আকবরকে তিনি কখনো ক্ষমা করতে পারেননি, তাই আকবরের সংকটকালে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন । তবে কোন বিশেষ সামাজিক শ্রেণি বা স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব তিনি করেননি । যেমন মনে করেছেন তেমন লিখেছেন । এইকারণে তাঁর গ্রন্থ-পাঠে অনেক সময় বিরক্তি এসে যায় । কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না যে তিনি জীবনকে সমস্ত দিক থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন । তিনি নতুন তথ্যের সন্ধান করেননি, কিন্তু উপহার দিয়েছেন সজীব, প্রাণবন্ত ইতিহাস, যাতে সে যুগের সময়ের প্রতিফলন ঘটেছে ।

✡ **ঐতিহাসিক হিসাবে আবদুল হামিদ লাহোরী ঃ** মোগল যুগের ইতিহাসচর্চায় আবদুল হামিদ লাহোরীর ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । আবুল ফজল যেমন আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস লিখেছেন, তেমনি শাহজাহানের রাজত্বকালের ইতিহাস লিখেছেন হামিদ লাহোরী । সরকারী ঐতিহাসিক হিসাবে লাহোরী খ্যাতিলাভ করেছেন । সম্ভবতঃ ১৬৪৭ খ্রিঃ লাহোরী শাহজাহানের রাজত্বকালে ইতিহাস রচনার কাজ শুরু করেছিলেন । তাঁর ইতিহাস জ্ঞান ছিল ব্যাপক এবং ঘটনা বিশ্লেষণী শক্তিও প্রখর ছিল । তিনি যে সময়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন তখন মোগল সাম্রাজ্য তার খ্যাতি ও গরিমার মধ্য গগনে । লাহোরীর রচনা থেকেই জানা যায় যে আগ্রা ও লাহোর সুবার এক একটি পরগণার আয়তন ও বার্ষিক রাজস্ব কীরূপ চমকপ্রদ ছিল । লাহোরীর লেখনীতে শহর নির্মাণের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে তার পরিকল্পনার প্রতিটি পদক্ষেপের ইতিহাস ।

পূর্বতন মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজলের ন্যায় লাহোরী খুঁটিনাটি বিষয়গুলির ওপর নজর দেন । তাঁর 'পাদশাহনামা' রচনার দিক থেকে আবুল ফজলের ধারাকে অনুসরণ করেনি । তাঁর মধ্যে ধর্মীয় ভাব ছিল প্রবল, তাই গ্রন্থের শুরুতেই তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে শরিয়ত অনুসরণ না করলে মানুষের মুক্তি নেই । তিনি প্রতিটি কার্য-কারণের পেছনে ধর্মীয় ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন । শাহজাহানের আমলে ইসলামের মৌলবাদীরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল বলে লাহোরী বিশেষ ভাবে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । 'পাদশাহনামা'-য় যেসব চিত্র অঙ্কিত আছে তাদের মধ্যে দিয়েও সেই ধর্মীয় পরিমন্ডল পরিস্ফুটিত । ইতিহাস চেতনা ও ধর্মীয় মনোভাব--এই দুয়ের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন লাহোরী ।

ঘটনার বিবরণী লেখার সময়ে যদিও লাহোরীর ধর্মীয় মনোভাবের পরিচয় সব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি । কারণ তিনি পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিক ছিলেন না । তবে নূরজাহানের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল প্রবল এবং তা কখনো লুকানোর চেষ্টাও করেননি । লাহোরীর 'পাদশাহনামা' একইসঙ্গে ছিল তৈমুর বংশীয়দের ইতিহাস এবং সাম্রাজ্যের দর্পণ । তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাস হল ঘটমান বিষয়গুলির যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ । তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন যে তৎকালীন সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও শক্তির জন্য দীর্ঘকালের শ্রম ও কল্পনা শক্তি প্রধান বিষয় । অর্থনীতি দুর্বল হলে সাম্রাজ্য যে দুর্বল হয়ে পড়ে একথাও তিনি বুঝেছিলেন । এই কারণে তিনি শাহজাহানের রাজত্বকালের সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের পরিসংখ্যান তৈরি করেন । শাহজাহান যে নিরলস প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন-- একথা লাহোরী উল্লেখ করেছেন ।

লাহোরীর বিশ্লেষণে আকবর থেকে শুরু করে শাহজাহান পর্যন্ত প্রতিটি সম্রাটের কর্মধারা ধরা পড়েছে । আকবরের দক্ষতার কারণে যে বিপুল সমৃদ্ধি ঘটেছিল তা বহুলাংশে নষ্ট হয় জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে । শাহজাহানের সঙ্গে নূরজাহানের ব্যক্তিত্বের সংঘাত তিনিই লিখে গেছেন । এথেকে প্রমাণিত হয় যে লাহোরী নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাস লিখেছেন । যদিও সরকারি বদন্যতায় লাহোরী লেখনী ধরেছিলেন, তাহলেও ব্যক্তি শাহজাহান অপেক্ষা সম্রাট শাহজাহানই তাঁর নিকট বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন । এপ্রসঙ্গে তিনি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের কর্মধারার তুলনামূলক আলোচনা যে করেছেন অবশ্যই তা যুগের অনুপাতে আধুনিক ছিল ।

তবে সমকালের কথা অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে লাহোরী ফুটিয়ে তুলেছেন । অসংখ্য যুদ্ধ করা সত্ত্বেও যে শাহজাহান সাড়ে নয় কোটি টাকা রাজকোষে সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছে সে কথাও লাহোরী লিখতে ভোলেননি । শাহাজানাবাদ শহর, তাজমহল, আগ্রার প্রাসাদসমূহ নির্মাণের তথ্য আমরা পাই তাঁর লেখনীর মাধ্যমে । এসবই সম্ভব হয়েছিল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুণার কারণে বলে লাহোরীর বিশ্বাস । অর্থাৎ মানুষের শ্রম ও ইচ্ছাশক্তির ওপর আছে ঈশ্বরের করুণা, লাহোরীর চিন্তা এইভাবেই চালিত হয়েছে । তাঁর গ্রন্থের শেষপর্বে সাম্রাজ্যের যাবতীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি, সৈয়দ, শেখ প্রভৃতির তালিকা আছে । প্রতিটি ব্যক্তির পদমর্যাদা পাওয়া যাবে এই অংশে ।

পরিশেষে লাহোরী তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন কাহিনী বিন্যাসের মাধ্যমে । কোন বিশেষ সূত্র এক্ষেত্রে তিনি অনুসরণ করেননি । তবে তিনি যে একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনে রত এবং সেটি হল ভাবীকালের কাছে তৎকালীন অবস্থার বিশ্লেষণ রেখে যাওয়া একথা তিনি ভোলেননি । ঐতিহাসিকদের কর্তব্য কী একথাও সম্ভবত তাঁর জানা ছিল যদিও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অভাব সেখানে আছে ।

✡ **ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ে ঃ** মোগল আমলে ভারতে আগত ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায় । ইউরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফরাসি পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ে । ডাক্তারির ছাত্র বার্ণিয়ের ভ্রমণের নেশা ছিল । ভ্রমণের সূত্র ধরেই তিনি ভারতে এসে উপস্থিত হন । তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত 'ভয়েজেস' থেকে মোগল ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বহু তথ্য পাওয়া যায় । সমসাময়িক অন্যান্য পর্যটকদের বিবরণীর সাথে তাঁর পার্থক্য হল অন্যরা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু তিনি ঘটনার পশ্চাদপট ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু বিশ্লেষণ সংযোজন করেছেন ।

১৬৫৮ খ্রিঃ শাহজাহানের অসুস্থতার সুযোগে তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সময় বার্ণিয়ে দিল্লীতে আসেন । তিনি সিংহাসনের উত্তরাধীকার দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন । তাঁর বর্ণনা থেকে ঔরঙ্গজেবের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কূটবুদ্ধির চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে । সরকারি কাজে তিনি ভারতের বড়বড় শহরে গিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন । শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব, দারা, সুজা, মুরাদ,

জাহানারা, রোশেনারা এমনকি মীরজুমলা ও শায়েস্তা খাঁর কথাও বার্ণিয়ে উল্লেখ করেছেন । ফরাসি মন্ত্রী কলবেয়ারকে মোগল শাসনতন্ত্রের কথা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন । কীভাবে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা আদায় করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ।

বার্ণিয়ে তাঁর বিবরণীতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের তুলনা করে বলেছেন, ভারতকে যথার্থ রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যায় না । ইউরোপের রাষ্ট্র অনেক বেশি উন্নত, আধুনিক ও যুক্তিবাদী । সেখানে ভারত অনুন্নত, যুক্তিহীন ও অজ্ঞ । ভারতে উত্তরাধিকার আইন না থাকায় গৃহযুদ্ধ অনিবার্য । বার্ণিয়ে মোগল সম্রাটদের স্বৈরাচারীর পাশাপাশি স্বেচ্ছাচারী বলেও উল্লেখ করেছেন । তাঁর চোখে ঔরঙ্গজেব ছিলেন ক্ষমতালোভী, দয়ামায়াহীন ও কূটকৌশলী । বরং আকবর ও জাহাঙ্গীর ছিলেন উদার ও সহিষ্ণু । ঔরঙ্গজেব এত বেশি কর সংগ্রহ করেছিলেন, যার জন্য হিন্দুস্তানে শিক্ষা, কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতি হয়নি । বার্ণিয়ে লিখেছেন, 'জায়গীরদারের শোষণ, লুণ্ঠনের আশঙ্কায় কৃষক জমির উন্নয়ণে উৎসাহ দেখাত না । অনেক সময় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে হিন্দু রাজাদের নিকট আশ্রয় নিত ।'

দিল্লী ও আগ্রা শহরের যে বর্ণনা বার্নিয়ে দিয়েছেন তা এক কথায় অমূল্য । দিল্লী যমুনা নদীর তীরে তিন দিক ইঁটের প্রাচীর দ্বারা অর্ধাচন্দ্রাকারে গঠিত । এখানকার রাস্তা, বাড়ি-ঘর, জল সরবরাহ, সৌধ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা তাঁর হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে । বড়বড় আমীরদের বাড়ি যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত, সাধারণ সিপাহী, ভৃত্যদের ঘর ছিল খুবই ছোট । বেশিরভাগই মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল ও চুনের প্রলেপ দিয়ে তৈরী । বার্ণিয়ে লিখেছেন, 'দিল্লীর দোকান গুলিতে পন্যদ্রব্য প্রকাশ্যে সাজিয়ে রাখা হত না, সেগুলি গুদাম ঘরে ক্রেতাদের চোখের বাইরে রাখা হত ।' মোগল সম্রাট ও অভিজাতদের বিপুল সম্পদের কথাও বার্ণিয়ের বিবরণে পাওয়া যায় । আমীর থেকে সাধারণ সিপাহী- সকলেই সোনা-রুপোর অলংকার পরিধান করত । তবে ভারতীয়রা যা সোনা-রুপো সঞ্চয় করত তা মাটির তলায় পুঁতে ফেলত ।

বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার সমৃদ্ধির কথা বার্ণিয়ে উল্লেখ করেছেন । এখানে প্রচুর পরিমানে ধান উৎপন্ন হত । এই ধান দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিদেশেও রপ্তানী করা হত । আখের চাষের জন্যও বাংলা বিখ্যাত ছিল । বাংলার চিনি আরব ও পারস্যে পাঠানো হত । সূতিবস্ত্র, রেশম, নীল ইত্যাদি বাণিজ্যিক পন্যও পাওয়া যেত । পর্তুগিজরা বাংলার মিষ্ঠি, শুকরের মাংস ও অন্যান্য লোভনীয় খাদ্যের আকর্ষণে বাংলায় বাস করতেন । বার্ণিয়ে কাশ্মীরের ভূ-সৌন্দর্য এবং সেখানকার লোকেদের বর্ণ ও দেহসৌষ্ঠবের প্রশংসা করেছেন ।

বার্ণিয়ের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায়, তিনি মোগলযুগের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে খুব বেশি ভুল ছিল না বলে অনেকে মনে করেন। কলবেয়ারকে লেখা চিঠিতে তিনি দিল্লীশ্বরের ধন-দৌলত, সৈন্যবাহিনী, দেশের আয়তন, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন । অত্যাধিক করের বোঝা এবং জায়গিরদারদের অত্যাচার কিংবা জমিদারের শোষণে কৃষক গ্রাম ছেড়ে চলে যেত তা অন্যান্য সূত্র থেকে সমর্থিত হয়েছে । বার্ণিয়ের কৃতিত্বের মুগ্ধ হয়ে পরবর্তীকালের পর্যটক কাউন্ট অব মোদভ তাকে 'পর্যটকদের যুবরাজ' বলে অভিহিত করেছেন ।

✡ **স্যার যদুনাথ সরকার ঃ** ইতিহাস চর্চা ও গবেষণায় স্যার যদুনাথ সরকার কোন পূর্বকল্পিত তত্ত্ব, ধারণা বা কোন মডেলের দ্বারা প্রভাবিত হননি । তাঁর লেখায় দার্শনিক র‍্যাঙ্কের পদ্ধতির প্রতি সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় । তবে সব ক্ষেত্রে তিনি র‍্যাঙ্কেকে অনুসরণ করেননি । তিনি মনে করেন ঐতিহাসিক কোন ঘটনা বা ব্যক্তির বিচার করবেন । র‍্যাঙ্কের উপাদান সংগ্রহ, উপাদান যাচাই ও তন্ময়তার তিনি সমর্থক, কিন্তু তাঁর অন্ধ অনুসরণকারী নয় । কোন সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় বা জাতিবিদ্বেষ তাঁর লেখাকে কলঙ্কিত করেনি । মোগল যুগের ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল । ঔরঙ্গজেব, শিবাজী, দুর্গাদাস, মহাদজি সিন্ধিয়া, আহম্মদ শাহ আবদালি প্রমুখ ছিলেন তাঁর প্রিয় নায়ক । তিনি মনে করেন পলাশিরর যুদ্ধে ভারতে মধ্যযুগের অবসান ঘটেছে, শুরু হয়েছে আধুনিক যুগের, নবজাগরণের ।

যদুনাথের নিকট লেখার আঙ্গিকও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না । তিনি অনেক প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় এসম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন । সন্দেহ নেই এই দিকটি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন এবং তাঁর লেখা ইতিহাস আকর্ষণীয় হয়েছে । সহজ সরল ভঙ্গিতে অনবদ্য ভাষায় তিনি লিখে গেছেন । কঠিন শব্দজাল বিস্তার করে আসল বিষয় থেকে তিনি দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেননি । অলঙ্কারবহুল ভাষা তিনি পছন্দ করতেন না । তাঁর লেখার আর এক বৈশিষ্ট্য হল পৃথিবীর ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে অজস্র উদ্ধৃতি নিয়ে তিনি লেখাকে আরও আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য করেছেন । ধুলোর মতো নীরস ইতিহাস লেখায় তাঁর আপত্তি ছিল, ঐতিহাসিক শুধু বিজ্ঞানী নন, শিল্পীও । মোগল ইতিহাসের নীরস কাঠামোয় তিনি প্রাণসঞ্চার করেছিলেন ।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ রূপে তিনি উল্লেখ করেছেন সমাজের অন্তঃস্থলে পচন ধরেছিল বলে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। রাজনৈতিক ও সামরিক অসহায়তার মধ্যে এর প্রকাশ দেখা গিয়েছিল । দেশ নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি, রাজতন্ত্র ছিল দুর্বল ও অপদার্থ, অভিজাতরা ছিল স্বার্থপর ও সংকীর্ণমনা । দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা শাসনের সর্বক্ষেত্রকে কলঙ্কিত করেছিল । এই অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের মধ্যে আমাদের সাহিত্য, শিল্প এমনকি সত্য ধর্মও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । যদুনাথের ইতিহাস পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যেমন-- ক) সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য তথ্যের ওপর জোর দেওয়া, খ) যার কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তার চরিত্র ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, গ) যে

ভাষায় উপাদান লিখিত তা আয়ত্ত করা, ঘ) অন্য উপাদানের সঙ্গে তুলনা করে তথ্য যাচাই করে নেওয়া, ঙ) অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করা এবং চ) সর্বাধিক উপাদান ব্যবহারের প্রয়াস ।

ইতিহাস দর্শনের ক্ষেত্রে যদুনাথের মূলকথা হল ইতিহাসের প্রায়োগিক উপযোগিতা । বর্তমান প্রজন্মের জন্য অতীত ইতিহাসের শিক্ষার প্রয়োজন আছে । বর্তমানের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অতীতজ্ঞান সহায়ক হয়, ভবিষ্যতের নির্দেশিকা হিসেবেও ইতিহাসের ভূমিকা আছে । বর্তমানের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে মুসলিম শাসনের পতনের কারণ যেমন অনুসন্ধান করতে হবে, তেমনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত মারাঠাদের রাষ্ট্র গঠনে ব্যর্থতার কথাও জানতে হবে । জীবনের সাধারণ সূত্র হিসেবে তিনি প্রগতিবাদকে গ্রহণ করেছেন । যদুনাথ মনে করেন ইতিহাসে ঈশ্বরের লীলা প্রত্যক্ষ করা যায় । ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভীরু যদুনাথ মনে করেন ইতিহাস হল ঐশ্বরিক শক্তিরই প্রকাশ । অনেক ক্ষেত্রে তিনি ঐশ্বরিক বিচারের কথা বলেছেন । যেমন বাদশাহ শাহ আলমের উপর নির্যাতনকারী আবদুল কাদিরকে মহাদজি সিন্ধিয়া মৃত্যুদন্ড দেন ।

পরিশেষে যদুনাথের রচনার ওপর সমকালের প্রভাব পড়েছিল । এই প্রভাব থেকে কোন ঐতিহাসিকই মুক্ত হতে পারেন না । চিন্তা ভাবনায় তিনি ছিলেন নরমপন্থী, রাজনীতি থেকে সব সময় দূরত্ব বজায় রেখে চলেছিলেন । ডঃ কানুনগো লিখেছেন, 'তাঁর অর্থনৈতিক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে চরমপন্থীরা জনমত গড়ে তুলেছিল ।' তিনি ভারতীয় জাতি গঠনের পথে বাধাগুলির উল্লেখ করে বলেছেন যে এদেশের হিন্দু ও ইসলামের পুর্ণজন্মের মধ্য দিয়ে নতুন জাতি গড়ে তোলা যেতে পারে । তিনি মনে করেন, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ উভয় ধর্মের সংস্কারে সহায়ক হতে পারে । তাঁর শিবাজি ও দুর্গাদাস চরিত্রের মধ্যে সমালোচকরা জাতীয়তাবাদী মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছেন । যদুনাথ র‍্যাঙ্কের মতো গভীরে প্রবেশ করে তথ্য সংগ্রহ করে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, কোন ভারতীয় ঐতিহাসিক তার তুল্য নয় । ভারতের ইতিহাস চর্চায় তিনি নিজ প্রতিভার আলোকে ভাস্বর হয়ে আছেন ।

✡ **আলিগড় গোষ্ঠী ঃ** মোগল যুগের ইতিহাস চর্চায় আলিগড় গোষ্ঠীর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন মহম্মদ হাবিব । এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা এযুগের সব কাজকর্মের মধ্যে ধর্মের এবং ধর্মীয় চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিলেন । মহম্মদ হাবিব মধ্যযুগের ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা দেন । তাঁর আধুনিক চিন্তা ভাবনা, নতুন দৃষ্টি এবং ইউরোপীয় ইতিহাস চিন্তার প্রভাব মধ্যযুগের ইতিহাস ভাবনায় নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছিল । এজন্য তাঁকে 'আধুনিক মুসলিম ইতিহাসচর্চার জনক' বলে অভিহিত করা হয় । তাঁর উপর আলিগড় গোষ্ঠীর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল । মহম্মদ হাবিব মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের অনুসৃত পথ অনুসরণ করেননি । তিনি মধ্যযুগের ইতিহাসের ঘটনাবলীকে যথাযথ প্রেক্ষিতে স্থাপন করে বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন । গজনির মামুদের চরিত্র ও কার্যাবলী ছিল এক বিরাট বিতর্কের বিষয় । হিন্দুদের কাছে একজন নিষ্ঠুর, মূর্তি ভঙ্গকারী আগ্রাসী আক্রমণকারী, অথচ গোড়া মুসলিমদের নিকট একজন খাঁটি জেহাদি।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সূত্রে হাবিব উপলব্ধী করেন যে মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন স্বচ্ছ চিন্তার পথ ধরতে পারেননি । এই সন্ধিক্ষণে হাবিব অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে লিখলেন, 'ইসলাম লুঠতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম সমর্থন করে না । সাধারণ মানুষ নিজ নিজ স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সব কিছুকে ধর্মের আবরণে মুড়ে ব্যাখ্যা দিতে থাকে ।' মহম্মদ হাবিব যা কিছু লিখেছিলেন খালেক আহম্মদ নিজামি তা দুই খন্ডে প্রকাশ করেন । তিনি ধারাবাহিক ইতিহাস লেখেননি, তাঁর রচনায় আছে ইতিহাস দৃষ্টি ও পদ্ধতি, ভারত ও তার এশীয় পরিবেশের ওপর আলোচনা, মধ্যযুগের মরমিয়াবাদ, আরবদের সিন্ধু জয়, গজনির সুলতান মামুদ, ঘুরির সিহাবুদ্দিন, দাস সুলতানদের উত্তরাধিকার, আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য জয়ের কাহিনি, মহম্মদ বিন তুঘলকের জীবনী ইত্যাদি ।

মহম্মদ হাবিব হলেন প্রথম মুসলিম ঐতিহাসিক যিনি বলেন যে মামুদ প্রকৃত মুসলমান ছিলেন না । কারণ অন্য ধর্মের মূর্তি ভাঙা ও লুঠতরাজ ইসলাম অনুমোদিত নয় । তিনি বহু অনৈস্লামিক কাজকর্ম করেছিলেন, সাধারণ মুসলমান যে তাকে প্রশংসা করেন কারণ তাঁরা বোঝেন না যে তিনি প্রকৃত পক্ষে জেহাদের কাজ করেননি । এসব হল গোড়া রক্ষণশীলদের কল্পনাবিলাসমাত্র । মামুদ পারস্যের রাজনৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করেন, ইসলামের খলিফা কেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণা থেকে সরে আসেন । হাবিব ভারতের মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানিয়ে বললেন মামুদকে বীর নায়ক ভাবার দরকার নেই । তিনি ভারতীয় নন, বিদেশি এবং আন্তরিকভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলেননি । এক প্রবন্ধে হাবিব জানান যে ইসলামের চরম শত্রুরা হলেন ধর্মোন্মাদরা । তাই কোনভাবেই মামুদের নীতিহীন কাজকর্মের অনুমোদন করা যায় না ।

ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য শুধু ইতিহাস নয়, তাই হাবিব শুধু বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখেননি । সমকালীন সামাজিক পরিবেশ ও স্বধর্মীদের চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন । জীবনের প্রথম ভাগে তিনি মনে করেন ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে । ধর্ম হল একান্তভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার, একে রাজনীতির সঙ্গে মেশানো ঠিক হবে না । কিন্তু তিনি দেখলেন মুসলিম জনগণের মনে রাষ্ট্র হল ধর্মরাষ্ট্র, আর মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা মনে করেন বিচ্ছিন্নতার

মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে । আলিগড়ের বৌদ্ধিক পরিবেশে তাঁর সঙ্গে কেউ সহমত হননি । তিনি মুসলমানদের ঐক্যের কথা প্রচার করেন, রাজনৈতিক স্তরে মৌলানা আজাদ একই ধারণা প্রচার করেন । কিন্তু বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে ঐক্যের স্বপক্ষে আনা সম্ভব হয়নি ।

পরিশেষে, হাবিবের নব্য ইতিহাস দর্শন তিনি মধ্যযুগের ভারত ইতিহাস ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেছেন । তিনি বলেছেন যে মধ্যযুগের ভারত বিদেশিদের অধীন বা সামরিক শাসনের অধীন ছিল না । ঘুর রাজ্যের তুর্কি শাসকগোষ্ঠী এদেশ অধিকার করে উত্তর ভারতে এক নগর বিপ্লব ঘটিয়েছিল । তুর্কিরা ছিল ভারত সীমান্তে, আক্ষরিক অর্থে ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে । সুতরাং রাজনৈতিক যে পরিবর্তন ঘটল তা হল উত্তর শাসকগোষ্ঠীকে সরিয়ে ঘুরিরা শাসক হয়ে বসেছিল । কিন্তু এরফলে উত্তর ভারতের শহুরে মজুররা বহু বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিল । ইসলাম তাদের নতুন শক্তি জুগিয়েছিল, পেয়েছিল নতুন অধিকার । দেখাগেছে মোঙ্গলরা ৫০ বছর ধরে ভারতের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়েও অধিকার করতে পারেনি । অথচ ইউরোপ ও এশিয়ার বহুদেশ তাদের আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়েছিল । মুসলিম শাসনে ভারতে নিম্নবর্ণের কৃষক উচ্চবর্ণের জমিদারের অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়েছিল । হয়তো এসব কারণেই ভারতে মুসলিম শাসন স্থায়িত্ব লাভ করেছিল ।

**--- সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ---**

১) ভারত ইতিহাস পরিক্রমা-- মাইতি ও মণ্ডল
২) মোগল রাজ থেকে কোম্পানী রাজ-- গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী
৩) ভারতের ইতিহাস-- তেসলিম চৌধুরী
৪) মোগল সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস-- অনিরুদ্ধ রায়
৫) মোগল যুগ থেকে কোম্পানী আমল-- সৌমিত্র শ্রীমানী
৬) মোগল ভারত কথা-- নীলেন্দু বিশ্বাস

## ------------------------ প্রশ্নাবলী ------------------------

## রচনাধর্মী প্রশ্ন (মান -১০)

১) মোগল ভারতে ইতিহাস চর্চার স্বরূপ আলোচনা করো ।
২) মোগল ভারতের ইতিহাসচর্চার বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে আলোচনা করো ।
৩) মোগল ভারতে ইতিহাস চর্চায় সমীক্ষা ও উৎসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করো ।
৪) ঐতিহাসিক হিসাবে আবুল ফজলের মূল্যায়ন করো ।
৫) ঐতিহাসিক হিসাবে আব্দুল কাদির বদাউনি-র মূল্যায়ন করো ।
৬) ঐতিহাসিক হিসাবে আবদুল হামিদ লাহোরীর মূল্যায়ন করো ।
৭) ঐতিহাসিক হিসাবে ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ে-র মূল্যায়ন করো ।
৮) ঐতিহাসিক হিসাবে স্যার যদুনাথ সরকারের কৃতিত্বের উল্লেখ করো ।
৯) দিল্লির ইতিহাস চর্চায় যদুনাথ সরকারের কৃতিত্ব আলোচনা করো ।
১০) মোগল ভারতের ইতিহাসচর্চায় আলিগড় গোষ্ঠীর ভূমিকা কি ছিল ।

## সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাধর্মী প্রশ্ন (মান-৫)

১) মোগল ভারতের ইতিহাস চর্চায় কয়টি ধারার প্রচলন ছিল ?
২) সাহিত্যিক উপাদানে মোগল ভারতের ইতিহাস কতদূর প্রস্ফুটিত হয়েছে ?
৩) ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মোগল ভারতে কি ধরণের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল ?
৪) স্যার যদুনাথ সরকারের ইতিহাস চর্চার মূল বৈশিষ্ট্য কি ছিল ?
৫) তোমার কি মনে হয় যে আবুল ফজল আকবরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন ?
৬) আকবরের গোড়া সমালোচক হিসাবে আব্দুল কাদির বদাউনি কতদূর সফল হয়েছিলেন ?

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (মান-২)

১) মোগলযুগের ইতিহাসের উপাদানগুলি কি কি ?
২) 'বাবরনামা' কী ?
৩) আবুল ফজল কে ছিলেন ?
৪) বার্ণিয়ে কে ছিলেন ?
৫) কাকে 'পর্যটকদের যুবরাজ' বলা হয় ?
৬) বাবরনামা-র ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী ?
৭) 'Columbus of Mughal History' কাকে কেন বলা হয় ?
৮) মোগলযুগের ইতিহাসচর্চায় আলিগড় গোষ্ঠীর ভূমিকা কি ছিল ?
৯) মোগলদের আদি পরিচয় নির্ণয় করো ।
১০) মোগল যুগে ইতিহাস চর্চার কয়টি ধারা আছে ?
১১) কোন গ্রন্থ থেকে মোগল আমলে বাংলার ইতিহাস জানা যায় ?
১২) যদুনাথ সরকারের ইতিহাস পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো ।
১৩) বদাউনি কেন আকবরের সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন ?
১৪) 'মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ' কী ?
১৫) 'রাজ্যাখ্যান' কী ?
১৬) মোগল যুগের ইতিহাসের উপাদানরূপে নথীপত্র গুলি কি ছিল ?
১৭) কোন কোন বিদেশি মোগল আমলের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন ?
১৮) ইতিহাস চিন্তার ক্ষেত্রে মোগল যুগে কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল ?
১৯) 'ভয়েজেস' কী ?
২০) বার্ণিয়ে দিল্লি নগরীর কি বর্ণনা দিয়েছেন ?
২১) বার্ণিয়ের বর্ণনা থেকে বাংলার কি চিত্র পাওয়া যায় ?
২২) 'Fall of the Mughal Empire' রচনার পটভূমি কি ছিল ?
২৩) 'আধুনিক মুসলিম ইতিহাসচর্চার জনক' কাকে বলা হয় ?

**---- সমাপ্ত ----**

**------**